ভূমিকা

জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করে 'বেদ' শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। তাই 'বেদ' শব্দের অর্থ হল জ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান। প্রাচীন ঋষিরা যে জ্ঞান আর্ষ দৃষ্টিতে প্রাপ্ত করেছিলেন, সেই জ্ঞানের সংগ্রহই হল বেদ। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে 'বেদ' শব্দ চারটি ধাতুতে বিভিন্ন অর্থে নির্মিত হয়। অর্থাৎ বিদ্ ধাতু চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই চারটি বিদ্ ধাতু হল—১। বিদ্ সত্তায়াম্ [বিদ্ ধাতুর অর্থ এখানে হওয়া, এই অর্থে এই ধাতু দিবাদিগণীয়] ২। বিদ্ জ্ঞানে [বিদ্ ধাতুর অর্থ এখানে জানা, এই অর্থে ধাতু অদাদিগণীয়] ৩। বিদ্ বিচারণে (এখানে বিদ্ ধাতু বিচরণ করা অর্থ, এই অর্থে বিদ্ ধাতু রুধাদিগণীয়) ৪। বিদৃ৯ লাভে [বিদ্ ধাতু তুদাদিগণীয়]। এই বিষয়ে একটি কারিকা আছে—

"সত্তায়াং বিদ্যতে জ্ঞানে, বেত্তি বিত্তে বিচারণে।
বিন্দতি বিন্দতে প্রাপ্তৌ, শ্যনলুকৃশ্নম্শোষ্বিদং ক্রমাৎ"।।

'বেদ' শব্দের ব্যাকরণগত বুৎপত্তি এই ভাবে নির্ণয় করা হয়—বিদ্ + ঘঞ্।

বিদ্ + অ ('লশকৃতদ্ধিতে' (পা.,১.৩.৮) সূত্রানুসারে ঘ্ এবং 'হলন্ত্যম্' সূত্রানুসারে ঞ্ এর লোপ)।

বেদ্ + অ ('সার্বধাতুকার্ধতুকয়োঃ' (পা.,৭.৩.৮৪) সূত্রানুসারে ধাতুর ইগন্ত অঙ্গের গুণ)।

বেদ ('কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ' (পা.,১.২.৪৬) সূত্রানুসারে প্রাতিপদিক সংজ্ঞা)।

বেদ + সু ('স্বৌজসমৌট.....' (পা.,৪.১.২) সূত্রানুসারে সু প্রত্যয়)।

বেদ + স্ ('উপদেশেঽজনুনাসিক ইৎ' (পা.,১.৩.২) সূত্রে উকারের লোপ)।

বেদ + রু ('সসজুষোরু' (পা.,৮.২.৬৬) সূত্রে স্ স্থানে রু আদেশ)

বেদ + র্ (অনুবন্ধ লোপ)।

বেদঃ ('খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ') পা.,৮.৩.১৫) সূত্রে বিসর্গাদেশ।

ঋক্প্রাতিশাখ্যের ব্যাখ্যাতে বিষ্ণুমিত্র 'বেদ' শব্দের অর্থ করেছেন—

'বিদ্যন্তে জ্ঞায়ন্তে লভ্যন্তে এভির্ধর্মাদিপুরুষার্থা ইতি বেদাঃ'। (বিষ্ণুমিত্র)

অর্থাৎ 'বেদ' শব্দের ভাবার্থ হবে—১. যে গ্রন্থের দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের অস্তিত্বের বোধ হয়। ২. এর দ্বারা পুরুষার্থ চতুষ্টয় এর জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। ৩. এর দ্বারা পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের প্রাপ্তি হয়। ৪. এতে পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের বিবেচন করা হয়েছে। এই সব বোধগম্য হয়, বেদ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ের সর্বাঙ্গীন বিবেচন করে এমন গ্রন্থে। আচার্য সায়ণ 'বেদ' শব্দের এক অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে 'বেদ' শব্দের অর্থ

হল—'ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারয়োরলৌকিকম্ উপায়ং যো গ্রন্থো বেদয়তি, স বেদঃ' (ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যভূমিকা)।

অর্থাৎ যে গ্রন্থ ইষ্ট-প্রাপ্তি এবং অনিষ্ট নিবারণের অলৌকিক উপায় নির্দেশ করে, সেই গ্রন্থকেই বেদ বলা হয়। আবার অন্যভাবে বলা যেতে পারে, যে গ্রন্থ উন্নতি এবং প্রগতির মার্গ দেখায়, তথা দুষ্কর্ম থেকে সৃষ্ট কুপরিণাম থেকে বাঁচার উপায় বলে, সেই গ্রন্থকে বেদ বলে।

বেদকে বোঝানোর জন্য নানা শব্দের প্রয়োগ করা হয়। যেমন—শ্রুতি, নিগম, আগম, ছন্দস্, ত্রয়ী, আম্নায়, স্বাধ্যায় ইত্যাদি। বেদকে কেনো এই সকল নামে অভিহিত করা হয়, এখন সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব—

১. শ্রুতি—বেদের প্রচলিত নামগুলির মধ্যে সব থেকে প্রচলিত নাম হল শ্রুতি। বেদকে শ্রুতি বলার কারণ হল বেদকে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় শুনে শুনে মনে রাখা হত এবং ছাপাখানাহীন তৎকালীন সময়ে এইভাবেই বেদকে রক্ষা করা হত। গুরু, পরম্পরাগত পদ্ধতি অনুসারে বেদ মন্ত্রের পাঠ করতেন এবং শিষ্য শ্রবণপূর্বক সেই মন্ত্রকে মনে রাখত। শিষ্য যাতে উচ্চারণের সময় স্বর এবং সুরের কোন পরিবর্তন না করে, সেই বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা হত। কারণ শিষ্য ভুল উচ্চারণ এবং ভুল স্বরের প্রয়োগ করলে তাহলে আর বেদের অক্ষুণতা বজায় থাকবে না। 'শ্রুতি' শব্দ ব্যাপকার্থে ব্যবহার হত। অর্থাৎ 'শ্রুতি' শব্দের দ্বারা কেবল চার বেদকেই বোঝাত না, এর দ্বারা ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্‌কেও বোঝাত। তাই দেখা যায়, ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ্ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার সময় 'ইতি শ্রুতি' বলা হত।

২. নিগম—বেদকে বোঝানোর জন্য 'নিগম' শব্দেরও প্রয়োগ করা হত। নিগম শব্দের অর্থ হল সার্থক বা অর্থবোধক। বেদ সাভিপ্রায়, সুসংহত এবং গভীরার্থযুক্ত হওয়ার জন্য বেদকে নিগম বলা হয়।

৩. আগম—আগম শব্দের প্রয়োগ বেদ এবং শাস্ত্র এই দুই অর্থেই করা হয়।

৪. ত্রয়ী—বেদকে বোঝানোর জন্য 'ত্রয়ী' শব্দের প্রয়োগও করা হয়। বেদত্রয়ীর অর্থ হল তিনটি বেদ—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদ। মীমাংসা দর্শনে 'ত্রয়ী' শব্দের প্রয়োগ বেদে ব্যবহৃত তিন প্রকার রচনাশৈলীর জন্য করা হয়েছে, অর্থাৎ পদ্যাত্মক রচনা ঋগ্বেদ, গদ্যাত্মক রচনা যর্জুবেদ এবং গীতাত্মক রচনা সামবেদ।

ক. 'তেষাম্ ঋক্ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা'।

খ. 'গীতিরূপাঃ মন্ত্রাঃ সামানি' / 'গীতিষু সামাখ্যা'।

গ. 'শেষে যজুঃ শব্দঃ'। (মীমাংসা দর্শন—২/১.৩৫-৩৭)।

৫. ছন্দস্—চারটি বেদকে বোঝানোর জন্য ছন্দস্ শব্দেরও প্রয়োগ হয়। পাণিনি

'বহুলং ছন্দসি' (পা-২/৪/৩৯, ৭৩, ৭৬) এই সূত্রের দ্বারা বেদকে 'ছন্দস্' বলেছেন। ছন্দস্ শব্দ 'ছদি সংবরণে' এই চুরাদিগণীয় ধাতু অনুসারে হয়েছে। এর অর্থ হল ঢাকা দেওয়া বা আচ্ছাদন করা। তাই যাস্ক নিরুক্তে বলেছেন 'ছন্দাংসি ছাদনাৎ'।

৬. আম্নায়—বেদের অর্থে 'আম্নায়' শব্দেরও প্রয়োগ করা হয়। 'ম্না অভ্যাস' এই ভ্বাদিগণীয় ধাতু থেকে 'আম্নায়' পদ সিদ্ধ হয়। সেই অর্থে এখানে 'বেদ' শব্দের দ্বারা প্রতিদিন অভ্যাস বা স্বাধ্যায় এর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। আচার্য দণ্ডী 'দশকুমারচরিতে' বেদকে বোঝানোর জন্য 'আম্নায়' শব্দের প্রয়োগ করেছেন—'অধীতী চতুর্ষু আম্নায়েষু' অর্থাৎ চার বেদের জ্ঞাতা। শ্রুতির মতো 'আম্নায়' শব্দের দ্বারা ব্রাহ্মণগ্রন্থ এবং উপনিষদ্‌কেও বোঝায়।

৭. স্বাধ্যায়— শতপথ ব্রাহ্মণে (১১.৫.৬.৩) বেদের জন্য 'স্বাধ্যায়' শব্দের প্রয়োগ আছে। 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য' অর্থাৎ বেদের অধ্যয়ন করা উচিত। উপনিষদ্ গুলিতেও বেদকে বোঝানোর জন্য 'স্বাধ্যায়' শব্দের প্রয়োগ করা হয়। যেমন তৈত্তিরীয়—উপনিষদে বলা হয়েছে—'স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্' (তৈ. উপ.,১.১১.১) অর্থাৎ বেদের অধ্যয়ন এবং প্রচারে প্রমাদ যেন না হয়। 'স্বাধ্যায়' শব্দের অর্থানুসারে এই শব্দের দ্বারা 'বেদ' স্ব অর্থাৎ আত্মার বিষয়ে মনন এবং চিন্তন তথা প্রতিদিন অভ্যাসের ওপরে জোর দেয়।

বেদ সম্বন্ধীয় প্রশস্তি	
<u>উক্তি</u>	<u>অবস্থান/ বক্তা</u>
বেদোঽখিলধর্মমূলম্।	মনুসংহিতা, মনু
ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারয়োরলৌকিকমুপায়ং। যো গ্রন্থো বেদয়তি স বেদঃ ।	ঐতরেয় ব্রাহ্মণভাষ্য; সায়ণ
প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বিদ্যতে। এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা।।	যাজ্ঞবল্ক্য
বেদো ধর্মমূলম্।	গোতম
মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্।	আপস্তম্ব
মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকশব্দরাশির্বেদঃ।	ঋগ্বেদ ভাষ্যভূমিকা, সায়ণ
ন কশ্চিৎ বেদকর্তাস্তি।	পরাশরসংহিতা, পরাশর
সামর্গ্যজুর্বেদাস্ত্রয়স্ত্রয়ী।	অর্থশস্ত্র, কৌটিল্য
তেষামৃক্ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা।	পূর্ব মীমাংসা, জৈমিনি
গীতিষু সামাখ্যা।	পূর্ব মীমাংসা, জৈমিনি
শেষে যজুঃ শব্দঃ।	পূর্ব মীমাংসা, জৈমিনি

বেদের মহত্ত্ব

বেদের মহত্ত্বকে পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা দুঃসাধ্য, কিন্তু সাংকেতিক রূপে আমরা এখানে কিছু তথ্য পরিবেশন করব।

ধার্মিক মহত্ত্ব—বেদ হল আর্যধর্মের আধারশিলা। ধর্মের মূলতত্ত্বকে জানার জন্য একমাত্র সাধন হল বেদ। তাই মনুসংহিতাতে বলা হয়েছে—

'বেদোঽখিল ধর্মমূলম্' (মনু-২.৬)। বেদকে সকল জ্ঞানের আধার মনে করে ভগবান্ মনু বেদকে 'সর্বজ্ঞানময়' বলেছেন। অর্থাৎ বেদের মধ্যে সকল প্রকার জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের সূত্র আছে। বেদে মানবমাত্রেরই কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে। ভগবান্ মনু বলেছেন—

'যঃ কশ্চিৎ কস্যচিৎ ধর্মো মনুনা পরিকীর্তিতঃ।
স সর্বোঽভিহিতো বেদে সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ'।। (মনুসংহিতা—২.৭)

মহর্ষি পতঞ্জলি মহাভাষ্যের প্রারম্ভে ব্রাহ্মণের অবশ্যকর্তব্য রূপে নিঃস্বার্থভাবে বেদাঙ্গের সঙ্গে বেদপাঠের কথা বলেছেন—

'ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ'। (মহাভাষ্য, আহ্নিক-১)

ভগবান্ মনু ব্রাহ্মণের বেদ অধ্যয়নের ওপরে এতোটাই জোর দিয়েছেন, তাঁর মতে ব্রাহ্মণের প্রধান তপঃ হল বেদ অধ্যয়ন। যে ব্রাহ্মণ বেদ-অধ্যয়ন না করে, অন্য শাস্ত্রতে আগ্রহ রাখে, সেই ব্রাহ্মণ সপরিবার শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়—

"বেদমেব সদাঽভ্যস্যেত, তপস্তপ্যন দ্বিজোত্তমঃ।
বেদাভ্যাসো হি বিপ্রস্য তপঃ পরমিহোচ্যতে।।" (মনু,—২.১৬৬)
"যোঽনধীতা দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ।।" (মনু.-২.১৬৮)

সাংস্কৃতিক মহত্ত্ব—বেদ ভারতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোত। ভারতীয় সংস্কৃতির যথার্থ জ্ঞান বৈদিকবাঙ্ময় থেকেই প্রাপ্ত হয়। প্রাচীনকালে বস্তুসমূহের নাম তথা মানবের কর্তব্যের নির্ধারণ বেদের দ্বারাই করা হত। তাই মনুসংহিতাতে বলা হয়েছে—

"সর্বেষাং তু স নামানি, কর্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ, পৃথক সংস্থাশ্চ নির্মমে।।" (মনু,—১.২১)

লোকমান্য তিলকের মতে বেদের প্রামাণিকতাকে মানাই আর্যত্ব এবং হিন্দুত্বের মুখ্য লক্ষণ—'প্রামাণ্যবুদ্ধির্বেদেষু'।

আর্যদের যজ্ঞের প্রতি অটুট বিশ্বাস, দেবাতার একক সত্ত্বাকে স্বীকার করা, বহুদেবতার স্তুতি, নিষ্কাম কর্মের উপাসনা, ঈশ্বরের সর্বব্যাপকতা, জ্ঞান এবং কর্ম মার্গের সমন্বয়, ভৌতিকবাদের প্রতি অনাস্থা, পুনর্জন্মে বিশ্বাস, জীবনের লক্ষ্য, মোক্ষাদির বাস্তবিক জ্ঞান

এই সমস্ত বৈদিক সাহিত্য থেকেই সম্ভব।

শাস্ত্রীয় মহত্ত্ব—ভগবান্ মনু বলেছেন সকল বিদ্যার মূল স্রোত হল বেদ—'সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ'। বেদে দার্শনিক সিদ্ধান্ত, রাজনীতিশাস্ত্র, সমাজশাস্ত্র, অধ্যাত্ম, মনোবিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ, গণিত, ভৌতিক, রসায়নশাস্ত্র, বনস্পতিশাস্ত্র, জন্তুবিজ্ঞান, বৃষ্টিবিজ্ঞান, কামশাস্ত্র এবং বিবিধ কলার অজস্র মন্ত্র বিদ্যমান। বেদের অধ্যাত্ম এবং দার্শনিক তত্ত্বকে আধার করে বিবিধ উপনিষদ্ এবং দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি।

আচার সংহিতা—মানবমাত্রের কর্তব্যবোধ জ্ঞানের একমাত্র আকর গ্রন্থ হল বেদ। এখানে কর্তব্যাকর্তব্যের যথাস্থান বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে। এতে গুরু-শিষ্য, পিতা-পুত্র, পতি-পত্নী, সমাজ এবং ব্যক্তি, রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয়তা, বিশ্ববন্ধুত্ব, পরোপকার, উদ্যোগ, দান-পুণ্য, সৎকর্ম এবং অতিথি সৎকারাদির বিস্তৃত বিবরণ এখানে পাওয়া যায়।

সামাজিক মহত্ত্ব—প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতি তথা সমাজের বিশদ চিত্রণ বৈদিক সাহিত্যে উপলব্ধ হয়। ঋগ্বেদে এবং অথর্ববেদে তৎকালীন সমাজ এবং সভ্যতার বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হয়। যজুর্বেদের ৩০ তম অধ্যায়ের ৫ থেকে ২২ তম মন্ত্রে ৫০ টির অধিক জীবিকাবৃত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল বৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাতির নাম এবং তাদের কর্মেরও বর্ণনা পাওয়া যায়। সংক্ষেপে ব্রাহ্মণাদির কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে ব্রাহ্মণের কর্তব্য হল জ্ঞানার্জন, ক্ষত্রিয়ের রক্ষাকার্য, বৈশ্যের বাণিজ্য এবং শূদ্রের কার্য হল শিল্প এবং শ্রমসাধ্য কার্য—

"ব্রহ্মণো ব্রহ্মণম্, ক্ষত্রায় রাজন্যম্, মরুদভ্যো বৈশ্যম্ তপসে শূদ্রম্।" (যজু-৩০.৫)

আর্থিক মহত্ত্ব—বেদে প্রাচীন অর্থ ব্যবস্থার বিশদ চিত্র উপলব্ধ হয়। বেদে কৃষি, আদান-প্রদানের ব্যবস্থা, ব্যবসা এবং বাণিজ্যের স্বরূপ, বিবিধ শিল্প, অন্ন-বস্ত্রাদির ক্রয়-বিক্রয়, ঋণদান এবং ঋণগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ক নানান্ তথ্য পাওয়া যায়। বলা হয়েছে ব্যবসায় সাফল্য পাওয়ার জন্য দুটি দিকে বিশেষ দৃষ্টি দান করতে হবে, যেমন—(১) চরিত্র—চরিত্রের শুদ্ধি এবং ব্যবহার-কুশলতা। (২) শ্রম, দৃঢ় সংকল্প এবং উৎসাহ। অর্থশাস্ত্রের মতে বাণিজ্যের মূলমন্ত্র হল সুষ্ঠু আদান-প্রদান এবং সঠিক লেন-দেন। যজুর্বেদের একটি মন্ত্রে এই বিষয়ে একটি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়—

(ক) 'শুনং নো অস্তু চরিতমুত্থিতং চ'। (অথর্ববেদ—৩.১৫.৪)

(খ) "দেহি মে দদামি তে, নি মে ধেহি নি তে দধে।
নিহারং চ হরামি মে, নিহারং নি হরাণি তে"।। (যজু—৩.৫০)

রাজনৈতিক মহত্ত্ব—বেদে রাজনীতি বিষয়ক বিবিধ তথ্য পাওয়া যায়। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল রাজ্যের উৎপত্তির সিদ্ধান্ত, রাজ্যের স্বরূপ উদ্দেশ্যে এবং কার্য্য, রাজ্যের বিবিধ অঙ্গ, রাজা নির্বাচন, রাজার কর্তব্য, সংবিধান এবং বিধিনির্মাণ, বিবিধ

শাসন প্রণালী। রাজ্যের সঞ্চালক, সভা, সমিতি, সংসদ এবং সংস্থা, করনির্ধারণ, শাস্ত্রাস্ত্র ইত্যাদি। প্রজার কর্তব্যাদির উল্লেখ করে বলা হয়েছে, তারা যেন রাষ্ট্রের রক্ষার জন্য সদা সচেষ্ট থাকে। এখানে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া হল—

'বয়ং রাষ্ট্রে জাগৃয়াম পুরোহিতাঃ স্যাম'। (যজু—৯.২৩)

'মহতে জানরাজ্যোয়.....'। (যজু—৯.৪০)

'বিশস্ত্বা সর্বা বাঞ্ছন্তু'। (অথর্ব-৬.৮৭.১)

'ত্বাং বিশো বৃণতাং রাজ্যম্'। (অথর্ব-৩/৪.২)

'সভা চ মা সমিতিশ্চাবতাং প্রজাপতের্দুহিতরৌ....'। (অথর্ব —৭.১২.১)

'সপ্ত সংসদঃ'। (অথর্ব —২০.১১০.২)

ঐতিহাসিক মহত্ত্ব—বেদের ঐতিহাসিক মহত্ত্ব অপরিসীম। যেমন— এখানে বিভিন্ন নদীর নাম, যেমন— গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ইত্যাদি (ঋগ্বেদ—১০.৩৫.৪), দাশরাজ্ঞ যুদ্ধ (ঋগ্বেদ—৭.৮৩.৬), বিভিন্ন জাতির নাম (যজু—৩০.৫ থেকে ২২) ইত্যাদি ইতিহাসনিষ্ঠ বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

ভাষাবৈজ্ঞানিক মহত্ত্ব—বিশ্বের সকল দেশের পণ্ডিতগণ স্বীকার করেছেন বিশ্ববাঙ্ময়ে সবথেকে প্রাচীন গ্রন্থ হল ঋগ্বেদ। ভাষাবৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের জন্য বেদকেই আধার মানা হয়। বেদের ভাষার সঙ্গে তুলনা করে তুলনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের বিকাশ হয়েছে। বৈদিক ভাষার সঙ্গে গ্রীক, ল্যাটিন, আবেস্থা ইত্যাদি ভাষার তুলনাত্মক অধ্যয়ন করে ভাষাসমূহের বিকাশের পরম্পরার স্পষ্ট জ্ঞান হয়।

কাব্যশাস্ত্রীয় এবং সাহিত্যিক মহত্ত্ব—বেদের অনেক মন্ত্রে অনুপ্রাস, যমক, রূপক, অতিশয়োক্তি, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি অনেক অলঙ্কারের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—যমক অলঙ্কারের প্রয়োগের একটি উদাহরণ যথা—'কবিভির্নির্মিতাং মিতাম্' (অথর্ব—৯.৩.১৯)। ঋগ্বেদের ঊষা সূক্তে ঊষাকে এক অত্যন্ত সুন্দরী যুবতী এবং পত্নীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। উদীয়মানা ঊষা এক সুন্দরীর মতো নিজের বস্ত্র চারিদিকে উড়াতে থাকে—

"অব স্যূমেব চিন্বতী মঘোন্যুষা যাতি স্বসরস্য পত্নী।
স্বর্জনন্তী সুভগা সুদংসা আন্তাদ্ দিবঃ পপ্রথ আ পৃথিব্যাঃ।।" (ঋগ্বেদ—৩.৬১.৪)

ঋষি এখানে ঊষাকে প্রেমিকা রূপে বর্ণনা করে বলেছেন সে সূর্যরূপী পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য হেসে নিজের বক্ষস্থল অনাবৃত করে সূর্যের দিকে অগ্রসর হয়—

"কন্যেব তন্বা শাশদানাঁ এষি দেবি দেবমিয়ক্ষমাণম্।
সংস্ময়মানা যুবতিঃ পুরস্তাদ্ আবির্বক্ষাংসি কৃণুতে বিভাতী।।"

(ঋগ্বেদ—১.১২৩.১০)

বেদের বৈজ্ঞানিক মহত্ত্ব—বেদে ভৌতিকতত্ত্ব, রসায়নশাস্ত্র, বনস্পতিশাস্ত্র, জন্তুবিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, পরিবেশ, বৃষ্টিবিজ্ঞান, ভূগর্ভবিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ ইত্যাদি মূলক অজস্র মন্ত্র বিদ্যমান। মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী বেদকে সকল সত্যবিদ্যার আকর বলেছেন। অথর্ববেদে প্রচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসা বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানে যে আয়ুর্বেদ নিয়ে সারা বিশ্বে চর্চা হচ্ছে সেই আয়ুর্বেদের আকর গ্রন্থ হল বেদ। তাই বেদের বৈজ্ঞানিক মহত্ত্ব অপরিসীম।

বেদের শাস্ত্রীয় মহত্ত্ব—শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে নির্লিপ্ত ভাবে চারবেদের অধ্যয়ন অত্যন্ত পুণ্যের। পৃথিবীর সকল দানের থেকেও মহান্ হল প্রতিদিন বেদ অধ্যয়ন। এর ফলে যোগক্ষেম, প্রাণ, ঐশ্বর্য, অন্নসমৃদ্ধি ইত্যাদির প্রাপ্তি হয়। সেখানে বলা হয়েছে—'যাবন্তং হ বা ইমাং পৃথিবীং বিত্তেন পূর্ণাং দদত্ লোকং , ত্রিস্তাবন্তং জয়তি, ভূয়াংসি চাক্ষয্যম্, য এবং বিদ্বান্ অহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে। তস্মাত্ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' (শতপথ ব্রাহ্মণ—১১.৫.৬.৩ থেকে ৭)

বৈদিক সাহিত্যের বিভাজন

বৈদিক সাহিত্যপাঠের সুবিধার জন্য বেদকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ্। চারটি বেদের চারটি সংহিতা আছে। যেমন—ঋগ্বেদসংহিতা, যজুর্বেদসংহিতা, সামবেদসংহিতা এবং অথর্ববেদসংহিতা। চারবেদ অনুসারে যজ্ঞে চারজন ঋত্বিকের কথা জানা যায়। যেমন—হোতা, অধ্বর্যু, উদগাতা এবং ব্রহ্মা। যজ্ঞে হোতা ঋগ্বেদের মন্ত্রের পাঠ করেন, তাই ঋগ্বেদকে হোতৃবেদ বলা হয়। অধ্বর্যু যজুর্বেদের মন্ত্রের পাঠ করেন, ইনিই যজ্ঞ করেন এবং যজ্ঞে ঘৃতাদির আহুতি দান করেন। উদগাতা সামবেদের মন্ত্রের গান করেন। ব্রহ্মা যজ্ঞের সঞ্চালন করেন, তিনিই যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা এবং নির্দেশক। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে চারজন ঋত্বিকের কর্মের নির্দেশ করা হয়েছে—

"ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্, গায়ত্রং ত্বো গায়তি শকরীষু।
ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিতীত উ ত্বঃ।।"

(ঋগ্বেদ—১০.৩১.১১)

বৈদিকবাঙ্ময়ের দ্বিবিধ বিভাজন—বর্ণিত বিষয় অনুসারে সমস্ত বৈদিক বাঙ্ময়কে দুইভাবে ভাগ করা হয়। যথা—কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড। বেদ এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থকে কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত করা হয়েছে। কারণ এতে বিবিধ যজ্ঞের কর্মকাণ্ডের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বেদে যজ্ঞীয় কর্মকাণ্ড সম্বন্ধিত মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থে সেই সবের বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত করা হয়েছে আরণ্যক এবং উপনিষদ্ গ্রন্থকে।

আরণ্যক গ্রন্থে যজ্ঞীয় ক্রিয়াকলাপের আধ্যাত্মিক এবং দার্শনিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকে আধার করে উপনিষদের সৃষ্টি হয়েছে। উপনিষদে আধ্যাত্মিক এবং দার্শনিক তত্ত্বের সমীক্ষা করা হয়েছে। এতে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, মোক্ষ ইত্যাদির বর্ণনা করা হয়েছে। তাই আরণ্যক এবং উপনিষদ্ জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত।

বেদাঙ্গ

'বেদাঙ্গ' শব্দের অর্থ হল বেদের অঙ্গ। 'অঙ্গ' শব্দের অর্থ হল সেই উপকারক তত্ত্ব যার দ্বারা বস্তুর স্বরূপ বোধ হয়। 'অঙ্গায়ন্তে জায়ন্তে এভিরিতি অঙ্গানি'। বেদের গূঢ় এবং বাস্তবিক অর্থ জানার জন্য যে সহায়ক তত্ত্বের আবশ্যকতা হয়, তাকেই বেদাঙ্গ বলে। বেদাঙ্গের দ্বারা মন্ত্রের অর্থ, তার ব্যাখ্যা, তথা যজ্ঞে তার বিনিয়োগাদির বোধ হয়। প্রারম্ভে বেদাঙ্গ স্বতন্ত্র বিষয় না হয়ে, বেদ অধ্যয়নের বিশিষ্ট উপযোগী সাধন ছিল। পরবর্তী কালে স্বতন্ত্র বিষয়রূপে বিকশিত হয়।

বেদাঙ্গের মহত্ত্ব—বেদমন্ত্রের শুদ্ধ উচ্চারণ জানার জন্য, শুদ্ধ শব্দার্থ জানার জন্য, মন্ত্রের বিনিয়োগ জানার জন্য, কাল-নির্ধারণের জন্য তথা ছন্দোজ্ঞানের জন্য বেদাঙ্গের আবশ্যকতা অপরিসীম। শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কি প্রকারে করা যাবে, তার জন্য শিক্ষা গ্রন্থের সৃষ্টি, শব্দের ব্যুৎপত্তি, ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ, তথা উদাত্তাদি স্বর ইত্যাদি জানার জন্য ব্যাকরণ এবং প্রাতিশাখ্য গ্রন্থের উৎপত্তি হয়েছিল। বেদে গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, জগতী ইত্যাদির যথাযথ জ্ঞানের জন্য ছন্দোশাস্ত্রের উৎপত্তি। শব্দ কীভাবে তৈরী হল, তার মূল অর্থ কী? তার পারিভাষিক অর্থ কী? ইত্যাদি সঠিক জ্ঞানের জন্য নিরুক্ত শাস্ত্রের আবির্ভাব। যজ্ঞ কখন করা উচিত, শুভ লগ্ন কখন আছে? পূর্ণিমাদি যজ্ঞের বিবিধ সময়ের নির্বচন জ্যোতিষ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। প্রত্যেক যজ্ঞের আদ্যোপান্ত কোন বিধি অনুসারে হবে? যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য কি কি বস্তুর দরকার হবে? যজ্ঞে কোন্ কোন্ মন্ত্রের পাঠ হবে? মন্ত্র পাঠের জন্য কতজন ব্রাহ্মণের দরকার হবে? যজ্ঞীয় বেদী কি প্রকার এবং কোন্ আকারের হবে ইত্যাদি সূক্ষ্মাদি বিষয়ে জ্ঞানের জন্য কল্প গ্রন্থের উৎপত্তি।

পাণিনীয় শিক্ষাতে বলা হয়েছে মন্ত্রের উচ্চারণে যদি স্বর বা বর্ণের সামান্য ত্রুটি হয় তাহলে সেই মন্ত্রে ইষ্টের পরিবর্তে অনিষ্ট হয়। এই বিষয়ে আমরা সবাই 'ইন্দ্রশত্রুর্বর্ধস্ব' ইত্যাদি আখ্যান জানি। তাই বেদ মন্ত্র পাঠের জন্য স্বর, বর্ণ, অর্থ ইত্যাদির জ্ঞান স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক।

"মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগবজ্রো যজমানং হিনস্তি

যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ।।"

(পা.শি.-৫২)

বেদাঙ্গের সংখ্যা এবং নাম—বেদাঙ্গের সংখ্যা মোট ৬টি। তাদের নাম হল—শিক্ষা, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ এবং কল্প। তাই বলা হয়েছে—

'শিক্ষা ব্যাকরণং ছন্দো নিরুক্তং জ্যোতিষং তথা।
কল্পশ্চেতি ষড়ঙ্গানি বেদস্যাহমনীষিণঃ'।।

বেদাঙ্গ সামান্যতঃ সূত্রাকারে লিখিত। পাণিনীয় শিক্ষাতে ৬টি বেদাঙ্গকে বেদপুরুষের ৬টি অঙ্গ বলা হয়েছে। যথা—ছন্দো হল বেদপুরুষের পা, কল্প হল হাত, জ্যোতিষ হল নেত্র, নিরুক্ত হল কান, শিক্ষা হল নাক এবং ব্যাকরণ হল মুখ—

"শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে।।
শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য, মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।।" (পা.শি.—৪১-৪২)

বেদাঙ্গের সর্বপ্রথম উল্লেখ মুণ্ডক উপনিষদে অপরা বিদ্যার অন্তর্গত চার বেদের নামের উল্লেখের পরে করা হয়েছে—'তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষম্ ইতি। (মুণ্ডক উপ.-১.১.৫)

শিক্ষা

সায়ণাচার্য ঋগ্বেদভাষ্যভূমিকাতে 'শিক্ষা' শব্দের অর্থ করেছেন যার দ্বারা স্বর, বর্ণ ইত্যাদি উচ্চারণের শিক্ষা দেওয়া হয় তাকেই শিক্ষা বলে—'স্বরবর্ণাদ্যুচ্চারণপ্রকারো যত্র শিক্ষ্যতে উপদিশ্যতে সা শিক্ষা'। তৈত্তিরীয় উপনিষদে শিক্ষার ৬টি অঙ্গের কথা বলা হয়েছে। যথা—বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল, সাম, সন্তান—'বর্ণ-স্বর-মাত্রা-বলম্-সাম-সন্তানঃ ইত্যুক্তঃ শিক্ষাধ্যায়ঃ।' (তৈ. উপ-১.২)। পাণিনীয় শিক্ষাতে মন্ত্রাদির পাঠকর্তার ৬টি গুণের কথা বলা হয়েছে। সেগুলি হল—মাধুর্য, অক্ষরব্যক্তি, পদচ্ছেদ, সুস্বর, ধৈর্য এবং লয়সমর্থ।

"মাধুর্যমক্ষরব্যক্তি পদচ্ছেদস্তু সুস্বরঃ।
ধৈর্যং লয়সমর্থং ষড়েতে পাঠকা গুণাঃ"।। (পা. শি.-৩৩)

সেই সঙ্গে পাঠকের ৬টি দোষের কথাও বলা হয়েছে। যথা—গীতী, শীঘ্রী, শিরঃকম্পী, লিখিতপাঠক, অনর্থজ্ঞ এবং অল্পকণ্ঠ।

"গীতি শীঘ্রী শিরঃকম্পী তথা লিখিতপাঠকঃ।
অনর্থজ্ঞোঽল্পকণ্ঠশ্চ ষড়েতে পাঠকাধমাঃ।।" (পা.শি.-৩২)

বিভিন্ন বেদের শিক্ষাগ্রন্থ—

ঋগ্বেদ – পাণিনীয়শিক্ষা, ঋক্প্রাতিশাখ্য।

যজুর্বেদ – বাজসনেয়ী প্রাতিশাখ্য, তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য, বাশিষ্ঠৌ শিক্ষা, মাণ্ডব্য শিক্ষা, ভরদ্বাজ শিক্ষা, অবসাননির্ণয় শিক্ষা।

সামবেদ – নারদীয় শিক্ষা, ঋক্তন্ত্র শিক্ষা, পুষ্পসূত্র প্রাতিশাখ্য।

অথর্ববেদ – মাণ্ডুকীশিক্ষা, শৌনকীয়প্রাতিশাখ্য, অথর্ববেদপ্রাতিশাখ্য।

ব্যাকরণ

'ব্যক্রিয়ন্তে বিবিচ্যন্তে শব্দা অনেনেতি ব্যাকরণম্' অর্থাৎ যে শাস্ত্রের দ্বারা শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়ের বিবেচন করা হয়, সেই শাস্ত্রকে ব্যাকরণ বলা হয়। এতে বিবেচনা করা হয়, যে শব্দ তার কিভাবে নির্মাণ হল? এই শব্দের প্রকৃতি কি? এবং প্রত্যয় কী? সেই অনুসারে শব্দের অর্থ কী ইত্যাদি। পাণিনীয় শিক্ষাতে ব্যাকরণকে বেদপুরুষের মুখ বলা হয়েছে। যেভাবে শরীরের মুখসৌন্দর্য, ভাবাভিব্যক্তি এবং গৌরবের প্রতীক সেই রকম ব্যাকরণশাস্ত্রে শব্দসাধুত্ব, প্রকৃতি-প্রত্যয় বিবেচন এবং শব্দার্থজ্ঞানের সাধন বিদ্যমান। এখানে পদ-পদার্থ, বাক্য-বাক্যার্থ ইত্যাদির বিস্তৃত বিবেচন আছে। ব্যাকরণই শুদ্ধ-অশুদ্ধ, সংস্কৃত-অসংস্কৃত, প্রাকৃত-অপভ্রংশ, নাম-আখ্যাত ইত্যাদির বিশ্লেষণ করে।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি মহাভাষ্যের প্রথম আহ্নিকে ব্যাকরণের ৫টি মুখ্য প্রয়োজনের কথা বলেছেন। যথা—রক্ষা, ঊহ, আগম, লঘু, অসন্দেহ। 'রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্'।

আচার্য পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে নিজের পূর্ববর্তী ১০ জন আচার্যের উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—আপিশলি, কাশ্যপ, গার্গ্য, ভরদ্বাজ, শাকটায়ন, স্ফোটায়ন ইত্যাদি। প্রাতিশাখ্যে পাণিনি পূর্ববর্তী প্রায় ৭৫ জন আচার্যের উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—শিব (মহেশ্বর), বৃহস্পতি, ইন্দ্র, আচার্য ব্যাড়ি, আত্রেয়, কাত্যায়ন, কাণ্ব, গৌতম, যাস্ক, বাল্মীকি, শাকল্য, শাকল, শৌনক, শাংখ্যায়ন, হারীত ইত্যাদি।

পাণিনি এবং পাণিনি পরবর্তী বৈয়াকরণ এবং তাদের গ্রন্থসমূহের নাম নিম্নে আলোচনা করা হল। পাণিনির লেখা অদ্বিতীয় ব্যাকরণ গ্রন্থ হল অষ্টাধ্যায়ী। কাত্যায়নের বার্ত্তিক, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়, জয়াদিত্য বামনের কাশিকা টীকা, কৈয়টের প্রদীপটীকা, ভট্টোজীদীক্ষিতের সিদ্ধান্তকৌমুদী, নাগেশ ভট্টের উদ্যোত টীকা (মহাভাষ্যের ওপরে লেখা), লঘুশব্দেন্দুশেখর, স্ফোটবাদ, মঞ্জুষা, লঘুমঞ্জুষা, পরমলঘুঞ্জুষা, বরদরাজের লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী এবং মধ্যসিদ্ধান্তকৌমুদী ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রাতিশাখ্য কথার অর্থ হল, প্রত্যেক শাখার সঙ্গে সম্বন্ধিত ব্যাকরণাদির বোধ করায় এমন গ্রন্থ। চারটি বেদের উপলভ্য প্রাতিশাখ্য গ্রন্থগুলি হল ঋগ্বেদের ঋক্‌প্রাতিশাখ্য, শুক্লযজুর্বেদের বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্য, কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য, সামবেদের অনেক প্রাতিশাখ্য পাওয়া যায়, যেমন পুষ্পসূত্র, ঋক্‌তন্ত্র ইত্যাদি। অথর্ববেদীয় প্রাতিশাখ্য হল শৌনিকীয় প্রাতিশাখ্য ইত্যাদি।

ছন্দো

'ছন্দো' শব্দ ছদ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে, এর অর্থ হল আচ্ছাদন করা। যাস্কাচার্য নিরুক্ত গ্রন্থে 'ছন্দস্' শব্দের নির্বচন দিয়েছেন—'ছন্দাংসি ছান্দনাত্' (৭.১২)। অর্থাৎ ছন্দো, ভাবকে আচ্ছাদিত করে তাকে সমষ্টীরূপ প্রদান করে। তার ফলে ছন্দো গেয় এবং সুপাঠ্য হয়। কাত্যায়ন সর্বানুক্রমণীতে ছন্দো শব্দের লক্ষণ দিয়েছেন—'যদক্ষরপরিমাণং তচ্ছন্দঃ' (১২.৬)। অর্থাৎ যার দ্বারা বর্ণ এবং সংখ্যার সংখ্যা নির্ধারিত হয়, তাকে ছন্দো বলে। অর্থাৎ বৈদিক ছন্দের আধার হল অক্ষর এবং সংখ্যা। অক্ষরের সংখ্যার ওপরে ছন্দের নাম নির্ভর করে।

বৈদিক ছন্দের আভাস যে সকল গ্রন্থ দেখা যায়, সেগুলি হল ঋক্‌প্রাতিশাখ্য (পটল ১৬ থেকে ১৮), শাংখায়ন শ্রৌতসূত্র (৩.২৭), সামবেদ নিদানসূত্র, আচার্য পিঙ্গালের ছন্দঃসূত্র, কাত্যায়নের ছন্দোঽনুক্রমণী।

ঋগ্বেদে মোট ২০টি ছন্দের প্রযোগ আছে। এদের মধ্যে কেবল ৭টি ছন্দ মুখ্যরূপে প্রযুক্ত হয়েছে। প্রধান সাতটি ছন্দের অক্ষর সংখ্যা এবং ব্যবহৃত মন্ত্র সংখ্যা নিম্নে আলোচনা করা হল—

ছন্দের নাম	ছন্দের অক্ষর	ঋগ্বেদে ব্যবহৃত মন্ত্র
গায়ত্রী	২৪	২৪৪৯
উষ্ণিক্	২৮	৩৯৮
অনুষ্টুপ্	৩২	৮৫৮
বৃহতী	৩৬	৩৭১
পঙ্‌ক্তি	৪০	৪৯৮
ত্রিষ্টুপ্	৪৪	৪২৫১
জগতী	৪৮	২৩৪৬

জগতীর থেকে অধিক ছন্দোযুক্ত অক্ষরও ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। যেমন—অতিজগতী (৫২ অক্ষর), শক্করী (৫৬ অক্ষর), অতিশক্করী (৬০ অক্ষর), অষ্টি (৬৪ অক্ষর), অত্যষ্টি

(৬৮অক্ষর), ধৃতি (৭২ অক্ষর), অতিধৃতি (৭৬ অক্ষর)।

নিরুক্ত

'নিরুক্ত' শব্দের অর্থ হল নির্বচন বা ব্যুৎপত্তি। শব্দকে মূলরূপে জানা, শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়ের স্পষ্টীকরণ, ধাত্বর্থ এবং প্রত্যয়ার্থের বিশদীকরণ, সমানার্থক এবং নানার্থক শব্দের বিবেচনাদি কাজ হল নিরুক্তের। ভাষাশাস্ত্রের দৃষ্টিতে নিরুক্তের মহত্ত্ব বিশাল। এর দ্বারা মূল জ্ঞান হয়। এখানে অর্থবিজ্ঞানের নানান্ বিধির সমাবেশ রয়েছে। শব্দের অর্থ কিপ্রকারে বিকাশ লাভ করে, কীভাবে একার্থক শব্দ অনেকার্থ হয়ে যায়, আবার কীভাবে বিভিন্নার্থক শব্দ একার্থক শব্দে পরিণত হয়, সমানার্থক শব্দের মধ্যে সূক্ষ্মভেদ, শব্দের অর্থের মধ্যে পরিবর্তন কীভাবে হয়, ইত্যাদি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। নিরুক্তের জন্য যাস্কাচার্যের নিরুক্ত গ্রন্থ পাওয়া যায়। এতে মোট ১২টি অধ্যায় আছে। শেষের পরিশিষ্ট ২টি অধ্যায় নিয়ে মোট ১৪টি অধ্যায় বিদ্যমান। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় যাস্কের লেখা নিরুক্তে কয়টি অধ্যায়, সেই প্রশ্নের উত্তর হবে ১২টি।

যাস্কের নিরুক্ত বস্তুতঃ নিঘণ্টু গ্রন্থের ব্যাখ্যা বা ভাষ্য। 'নিঘণ্টু' বৈদিক শব্দকোষ বা বৈদিকশব্দের সংকলন। এতে মোট ৫টি অধ্যায় আছে। এতে সংগৃহীত শব্দের সংখ্যা ১৭৬৮ টি। অধ্যায় অনুসারে শব্দ সংখ্যা হল—প্রথম অধ্যায়ে ৪১৪টি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫১৪টি, তৃতীয় অধ্যায়ে ৪১০টি, চতুর্থ অধ্যায়ে ২৭৯টি এবং পঞ্চম অধ্যায়ে ১৫১টি। মহাভারতের শান্তিপর্ব অনুসারে নিঘন্টুর রচয়িতা হলেন প্রজাপতি কশ্যপ। (মহাভারত/অধ্যায় ৩৪২/শ্লোক ৮৮ থেকে ৮৯)—'নৈঘণ্টুকপদাখ্যানে...প্রাহ কশ্যপো মাং প্রজাপতিঃ'।

নিরুক্তের ব্যাখ্যাকার দুর্গাচার্য বলেছেন—'নিরুক্তং চতুর্দশপ্রভেদম্' (১.১৩) অর্থাৎ যাস্কসহিত ১৪ জন নিরুক্তকার ছিলেন। এদের মধ্যে ১২ জনের নাম যাস্ক নিরুক্ত গ্রন্থেই উল্লেখ করেছেন। যাস্কের পূর্ববর্তী মুখ্য নিরুক্তকারগণ হলেন আগ্রায়ণ, ঔপমন্যব, ঔর্ণবাভ, গার্গ্য, গালব, বার্ষ্যায়ণি, শাকপুণি ইত্যাদি।

নিরুক্তের টীকাকারগণের মধ্যে সম্প্রতি ৩টি টীকা পাওয়া যায়। সেগুলি হল—দুর্গাচার্যের ঋজ্বর্থ-বৃত্তি, স্কন্দমাধব, বররুচির নিরুক্ত-নিচয়।

জ্যোতিষ

জ্যোতিষ শব্দের অর্থ হল জ্যোতির্বিজ্ঞান। এখানে সূর্য, চন্দ্র গ্রহাদির সম্বন্ধিত বিজ্ঞান সম্বন্ধিত বিজ্ঞান হল জ্যোতির্বিজ্ঞান। লগধ বলেছেন 'জ্যোতিষাম্ অয়নম্' অর্থাৎ নক্ষত্রাদির গতি বিবেচন করা হয় যে গ্রন্থে, সেই শাস্ত্রকে বলা হয় জ্যোতিষ। তিনি বলেছেন—'কালজ্ঞানশাস্ত্র বা কালবিজ্ঞানশাস্ত্র' (কালবিজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি। শ্লোক-২)। এতে

কালচক্র, সংবৎসরচক্র তথা কালসম্বন্ধিত তথ্যের আলোচনা করা হয়েছে। এইভাবে জ্যোতিষ কালবিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান এই দুয়ের সমন্বয় হয়েছে।

বেদের সর্বাধিক মহত্ত্ব হল যজ্ঞে। আর এই যজ্ঞের কালনির্ধারণের জন্য জ্যোতিষ শাস্ত্রের মূল্য অপরিসীম। যেমন তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে—ব্রাহ্মণ বসন্তকালে অগ্নির স্থাপনা করবেন, ক্ষত্রিয় গ্রীষ্মকালে এবং বৈশ্য শরৎ কালে—'বসন্তে ব্রাহ্মণোঽগ্নিমাদধীত, গ্রীষ্মে রাজন্যঃ, শরদি বৈশ্যঃ (তৈ. আ—১.১)। একই রকম তাণ্ড্রব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে, দীক্ষা একাষ্টকার দিন বা ফাল্গুনের পূর্ণিমার দিন করতে হবে।—'একাষতকায়ং দীক্ষেরন্ ফাল্গুনে দীক্ষেরন্'। (তা.ব্রা-৫.৯.১.৭) একইরকম ভাবে অন্যান্য যজ্ঞের জন্য কাল নির্ধারণ করা হয়েছে। এইসকল ক্ষেত্রে সঠিক কাল নির্ধারণ করার জন্য জ্যোতিষ শাস্ত্রের আবশ্যকতা অনিবার্য। জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক সর্বাধিক প্রাচীন এবং প্রামাণিক গ্রন্থ হল লগধের বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ।

কল্প

আচার্য সায়ণ 'কল্প' শব্দের অর্থ করেছেন, যে গ্রন্থে যজ্ঞ সম্বন্ধিত বিধির সমর্থন বা প্রতিপাদন করা হয়েছে তাকে কল্প বলে। ঋগ্বেদের প্রাতিশাখ্যের টীকায় বিষ্ণুমিত্র বলেছেন, যে গ্রন্থে বৈদিক যজ্ঞাদি কর্মের বিবিধ বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সেই গ্রন্থকে কল্প বলা হয়। অর্থাৎ বেদে বর্ণিত ছোট এবং বড়ো যজ্ঞের সর্বাঙ্গ বিধি-বিধান যে গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে সেই গ্রন্থকে কল্প বলা হয়। এই গ্রন্থ সূত্রাকারে লিখিত হওয়ার জন্য একে কল্পসূত্র বলা হয়েছে। সায়ণ বলেছেন—'কল্প্যতে সমর্থ্যতে যাগপ্রয়োগোঽত্র ইতি ব্যুৎপত্তেঃ'। বিষ্ণুমিত্র বলেছেন—'বেদবিহিতানাং কর্মাণাম্ আনুপূর্ব্যেণ কল্পনাশাস্ত্রম্'। কল্পসূত্র গুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

১. শ্রৌতসূত্র – 'শ্রৌত' শব্দের অর্থ হল শ্রুতি প্রতিপাদিত বা বেদে বর্ণিত। 'শ্রুতি' শব্দ থেকে 'শ্রৌত' শব্দের উৎপত্তি। শ্রৌতসূত্রে বেদে বর্ণিত বড় যজ্ঞ-যাগ-ইষ্ট্যাদির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে প্রারম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত কী কী করতে হবে, ইত্যাদি ক্রমানুসারে বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই সকল বিশিষ্ট যাগের মধ্যে মুখ্য হল—দর্শপূর্ণমাস, সোমযাগ, বাজপেয়, রাজসূয়, অশ্বমেধ, সৌত্রামণী ইত্যাদি।

২. গৃহ্যসূত্র – এখানে গৃহস্থ সম্বন্ধিত ১৬টি সংস্কার, ৫টি মহাযজ্ঞ, ৭টি পাকযজ্ঞ, গৃহনির্মাণ, গৃহ-প্রবেশ, পশুপালন এবং কৃষিকর্মাদির সঙ্গে সম্বন্ধিত যজ্ঞবিধির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

৩. ধর্মসূত্র – ইহা আচার সংহিতার সঙ্গে সম্বন্ধিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থ হল স্মৃতিশাস্ত্রের পূর্বরূপ। এখানে বর্ণাশ্রমের কর্তব্য, আচার-বিচার, মান্যতা এবং সামাজিক জীবনের কর্তব্য

এবং অকর্তব্যাদির বিশদ বিবরণ আছে।

৪. **শুল্বসূত্র** – এটি একটি শুদ্ধ গণিতশাস্ত্রীয় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। এখানে গণিতশাস্ত্রের অঙ্গ জ্যামিতিশাস্ত্র সম্বন্ধিত বহু তথ্য আছে। এখানে ছোট বড় অনেক প্রকার বেদী নির্মাণের নিয়ম-কানুন আছে।

বিভিন্ন বেদে প্রাপ্ত শ্রৌতসূত্রাদির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল—

বেদের নাম	শ্রৌতসূত্র	গৃহ্যসূত্র	ধর্মসূত্র	শুল্বসূত্র
ঋগ্বেদ	আশ্বলায়ন শাঙ্খায়ন	আশ্বলায়ন, শাঙ্খায়ন, কৌশিতকী	বশিষ্ঠ	-
সামবেদ	লাট্যায়ন বা আর্ষেয়, দ্রাহ্যায়ণ, জৈমিনীয়	গোভিল, খাদির, জৈমিনীয়	গৌতম	-
কৃষ্ণযজুর্বেদ	বৌধায়ন, আপস্তম্ব, মানব, সত্যাষাঢ় বা বৈখানস, কাঠক, বাধুল, হিরণ্যকেশী	বৌধায়ন, মানব, বৈখানস, কাঠক, হিরণ্যকেশী	বৌধায়ন, আপস্তম্ব, মানব, বৈখানস, হিরণ্যকেশী	বৌধায়ন
শুক্লযজুর্বেদ	কাত্যায়ন	পারস্কর বা বাজসনেয়	শঙ্খলিখিত	কাত্যায়ন
অথর্ববেদ	বৈতান	কৌশিক	পঠিনসী	-

এছাড়াও পৈঙ্গা, পরাশর, ঐতরেয়, বহ্বৃচ, শাকল্য, বারহ, অগ্নিবেশ্য, বৈজবাপ, কাশ্যপ, বিষ্ণু, ভারবীয় ইত্যাদি প্রচলিত অনেক কল্পসূত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বেদ সংরক্ষণের উপায়

অষ্ট বিকৃতি – বেদ মন্ত্র উচ্চারণ এবং তার সুরক্ষার জন্য কিছু উপায় অবলম্বন করা হত, এদের বিকৃতি বলা হয়। এতে মন্ত্রের পদগুলিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উচ্চারণ করা হত। এই রকম মোট আটটি বিকৃতি ছিল। যথা– ১. জটা পাঠ ২. মালা পাঠ ৩. শিখা পাঠ ৪. রেখা পাঠ ৫. ধ্বজ পাঠ ৬. দণ্ড পাঠ ৭. রথ পাঠ ৮. ঘন পাঠ।

"জটা মালা শিখা রেখা ধ্বজো দণ্ডো রথো ঘনঃ।
অষ্টৌ বিকৃতয়ঃ প্রোক্তাঃ ক্রমপূর্বা মহর্ষিভিঃ।।"

উপর্যুক্ত আটটি পাঠ ছাড়া আরও ৩টি পাঠ পাওয়া যায়—সংহিতা পাঠ, পদপাঠ এবং ক্রমপাঠ। বেদের সুরক্ষার জন্য এই উপায়গুলির মধ্যে ৬টি উপায় মুখ্য। এখানে সেগুলি উদাহরণ সহকারে আলোচনা করা হল—

১. **সংহিতাপাঠ**—এতে মন্ত্র নিজের মূলরূপে থাকে।

২. **পদপাঠ**—এতে মন্ত্রের প্রত্যেক পদকে পৃথক্ করে পাঠ করা হয়। যদি কোন সন্ধি থাকে সেক্ষেত্রে এই পাঠের সময় সন্ধি ভেঙে দেওয়া হয়। এর ফলে প্রত্যেক শব্দ তার স্বতন্ত্ররূপে থাকে। অর্থাৎ উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যদি সংহিতাপাঠে 'কখগঘ' এই রকম থাকে, তাহলে পদপাঠে ক খ গ ঘ এইরূপে পাঠ করা হয়।

৩. **ক্রমপাঠ**—এতে পদের ক্রম এই রূপে থাকে—কখ, খগ, গঘ।

৪. **জটাপাঠ**—এতে পদের এই রকম ক্রম থাকে—কখ, খক, কখ। খগ, গখ, খগ।

৫. **শিখাপাঠ**—এতে পদের এইরূপ ক্রম থাকে—কখ, খক, কখগ। খগ, গখ, খগঘ।

৬. **ঘনপাঠ**—এতে পদের এইরূপ ক্রম থাকে—কখ, খক, কখগ, গখক, কখগ।

এইভাবে পাঠের কারণে আজ হাজার বছর পরেও মন্ত্রের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় নি। সকল মন্ত্র মূলরূপে সুরক্ষিতভাবে বর্তমান।

বৈদিক বাঙ্ময় সারণী

বেদের নাম	শাখা	ব্রাহ্মণ	আরণ্যক	উপনিষদ্
ঋগ্বেদ	শাকল, বাস্কল	ঐতরেয়, কৌষিতকী বা শাঙ্খায়ন	ঐতরেয়, শাঙ্খায়ন	ঐতরেয়, কৌষিতকী, বাস্কল
শুক্লযজুর্বেদ	মাধ্যন্দিন, কাণ্ব	শতপথ ব্রাহ্মণ	বৃহদারণ্যক	মন্ত্রোপনিষদ্ বা ঈশোপনিষদ্, বৃহদারণ্যকোপনিষদ্

বেদের নাম	শাখা	ব্রাহ্মণ	আরণ্যক	উপনিষদ্
কৃষ্ণযজুর্বেদ	তৈত্তিরীয়, মৈত্রায়ণি, কঠ, কাঠক, কপিষ্ঠল	তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ	তৈত্তিরীয় আরণ্যক	তৈত্তিরীয় কঠ,শ্বেতাশ্বতর, মৈত্রায়ণী, মহানারায়ণ উপনিষদ্
সামবেদ	কৌথুম, রাণায়নীয়, জৈমিনীয়	(কৌথুমীয়) তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ, ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ, সামবিধান, আর্ষেয়, মন্ত্র, দেবতাধ্যায়, বংশ, সংহিতোপনিষদ্ ব্রাহ্মণ (জৈমিনীয়) জৈমিনীয়, তলবকার, জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ	তলবকার আরণ্যক	ছান্দোগ্যোপনিষদ্ কেনোপনিষদ্
অথর্ববেদ	শৌনক, পৈপ্পলাদ	গোপথ ব্রাহ্মণ		প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য

বেদ পৌরুষেয় না অপৌরুষেয়

বেদের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় যে, বেদ কোন পুরুষ বা ঋষির দ্বারা লেখা হয়েছে না, ঈশ্বরীয় জ্ঞান অর্থাৎ অপৌরুষেয়। ভারতীয় দর্শনে এই বিষয়ে বিস্তর চর্চা করা হয়েছে। এই বিষয়ে একটু সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য অনুসারে বেদ অপৌরুষেয়। বেদের রচয়িতা কোন ব্যক্তিবিশেষ বা ঋষি নয়। সৃষ্টির আদিতে পরমাত্মা যেমন লোকানুগ্রহের জন্য সূর্য, চন্দ্র, জল, বায়ু ইত্যাদি প্রদান করেছেন, তেমনিভাবে সকল মানুষের মার্গদর্শনের জন্য বেদের পরমসিদ্ধ জ্ঞান ঋষিদের দান করেছেন। ঋষিরা সেই জ্ঞান প্রসার করেছেন। যে যে ঋষি

যে যে মন্ত্রের দর্শন করেছেন, সেই মন্ত্রের সঙ্গে তার নাম স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে থেকে গেছে।

ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, শতপথ ব্রাহ্মণ এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ইত্যাদিতে বলা হয়েছে, চার বেদের জ্ঞান পরমাত্মার দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে। তিনিই অগ্নি, বায়ু, আদিত্য এবং অঙ্গি এই ঋষিদের ক্রমে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদের জ্ঞান দান করেছেন। ঋগ্বেদ এবং যজুর্বেদে বলা হয়েছে বিরাট পুরুষ থেকেই ঋক্, সাম, যজু এবং অথর্ব বেদের উৎপত্তি হয়েছে।

"তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত।।"

অথর্ববেদে বলা হয়েছে চারটি বেদ বিশ্বের আধারভূত ঈশ্বর থেকে প্রাদুর্ভূত হয়েছে—

"যস্মাদ্ ঋচো অপাতক্ষণ্ যজুর্যস্মাদপাকষণ্।
সামানি যস্য লোমানি অথর্ববাঙ্গিরসো মুখম্।।" (অথর্ব—১০.৭.২০)

শতপথ ব্রাহ্মণে এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে এই চারটি বেদ ব্রহ্মের শ্বাসরূপ—

"এবং বা অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ যদ।
ঋগ্বেদো যজুর্বেদ সামবেদো অথর্বাঙ্গিরসঃ।।"

(শত.ব্রা.—১৪.৫.৪.১০)/ (বৃহ. উপ.—৪.৫.১১)

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্ম উৎপন্ন হয়েছে এবং পরমাত্মা তার জন্য বেদের জ্ঞান প্রকট করেছেন—

"যো ব্রহ্মণং বিদধাতি পূর্বং, যো বৈ বৈদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।"

(শ্বেত. উপ.—৬.১৮)

ভগবান্ মনুর মতেও বেদ অপৌরুষেয়। তাই তিনি বলেছেন পরমাত্মা অগ্নি, বায়ু এবং সূর্যের দ্বারা নিত্য ঋক্, যজুঃ এবং সামবেদের সৃষ্টি করেছেন—

"অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থম্ ঋগ্যজুঃসামলক্ষণম্।।" (মনু.-১.২৩)

শতপথ ব্রাহ্মণে এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে একটি মহত্ত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে, যেভাবে সকল প্রকার জলের আধার হল সমুদ্র, সেইরকম সকল জ্ঞানের আধার হল বাগ্ব্রহ্ম। সকল বেদের জ্ঞান সেই বাগ্ব্রহ্ম থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, অর্থাৎ জ্ঞানের মূল উৎস হল ব্রহ্ম। সৃষ্টির আদিতে সেই সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম থেকেই বেদজ্ঞানরূপী পবিত্র জলধারা প্রবাহিত হয়েছে—

"যথা সর্বাসাম্ অপাং সমুদ্র একায়নম্....এবং সর্বেষাং বেদানাং বাগেকায়নম্।"

(বৃহ. উপ.—৪.৫.১২)/(শত.ব্রা.-১৪.৫.৪.১১)

ঋগ্বেদেও বেদের নিত্যতা এবং অপৌরুষেয়তার প্রতিপাদন করা হয়েছে। ঋগ্বেদে বলা

হয়েছে বেদরূপী বাণী বিচিত্র এবং নিত্য—'বাচা বিরুপনিত্যয়া'। (ঋগ্বেদ—৮.৭৫.৬) নিরুক্তকার যাস্কাচার্য বলেছেন ঋষিরা বেদকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরা বস্তুতঃ বেদের রচনাকর্তা নন— 'সাক্ষাৎকৃতধর্মাণ ঋষয়ো বভুবঃ'। (নিরুক্ত—১.১০) তাই 'ঋষি' শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে—'ঋষির্দর্শনাত্' অর্থাৎ ঋষিরা বেদকে দর্শন করেছেন, রচনা করেন নি। মীমাংসা দর্শন এবং বেদান্ত দর্শনেও বেদের অপৌরুষেয়তা স্বীকার করা হয়েছে। মীমাংসা দর্শনে অপৌরুষেয়তা বিষয়ে বিস্তর সমীক্ষা করা হয়েছে এবং সেই নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষ যুক্তির আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বপক্ষে বলা হয়েছে—

১. বেদ মানুষের মৌলিক কৃতি যেমন কালিদাসাদি কবিগণ বিবিধ কাব্যের সৃষ্টি করেছেন—'বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যা' (মীমাংসাসূত্র—১.১.২৭)।

২. এতে অনিত্যাদি ব্যক্তিবর্গের নাম নেওয়া হয়েছে, যেমন—'ববরঃ প্রাবাহর্ণিকাময়ত'। (তৈ.সং-৭.১.১০.২) অর্থাৎ প্রবহনের পুত্র ববর কামনা করেছিলেন।

এই সবের উত্তরে বলা হয়েছে বেদ অনাদি এবং অপৌরুষেয়। কঠ, কাথুম, তিত্তিরাদি ঋষিদের মধ্যে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। তাই প্রবচন কর্তারা এই সকল শাখার প্রচারের সময় এই সকল নামকরণ করেছেন—'আখ্যা প্রবচনাৎ' (মীমাংসা সূত্র—১.১.৩০)।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, 'ববরাদি' শব্দ কোন ব্যক্তিবাচক নয়, এটি প্রবহন অর্থাৎ বায়ুর পুত্রের সংকেত, তার ভর-ভর ধ্বনির জন্য এই নামকরণ হয়েছে—'পরং তু শ্রুতি সামান্যমাত্রম্' (মীমাংসাসূত্র—১.১.৩১)।

বেদান্ত দর্শনে এবং সাংখ্যা দর্শনেও বেদকে স্বতঃপ্রমাণ এবং অপৌরুষেয় বলা হয়েছে। বেদান্ত পরমাত্মাকে বেদজ্ঞানের কারণ এবং আধার মনে করে—'শাস্ত্রয়োনিত্বাত্' (ব্রহ্মসূত্র—১.১.২)।

সাংখ্যদর্শনে বলা হয়েছে বেদ নিজের শক্তির ওপর আধারিত। তাই তার প্রতিপাদিত বিষয়ের জন্য অন্য কোন প্রমাণের আবশ্যকতা নেই—'নিজশক্ত্যভিব্যক্তঃ স্বতঃ প্রমাণ্যম্'। (সাংখ্যসূত্র—৫.৫১)

মহাভারতেও বলা হয়েছে বেদ নিত্য। বেদ প্রলয়কালে অন্তর্হিত হয় এবং সৃষ্টির সময় ঋষিগণ নিজের দিব্যদৃষ্টির দ্বারা বেদের জ্ঞান প্রাপ্ত করেন—

"যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্বমনুজ্ঞাতা স্বয়ম্ভুবা।" (মহাভা./বনপর্ব)

ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শন ঈশ্বরকে বেদের প্রণেতা বলা মনে করেন। তারা মনে করেন বেদে সার্থক জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, তাই এই সকল জ্ঞানের কর্তা কোন জ্ঞানবান্ বা সর্বজ্ঞ। পরমাত্মাই সর্বোৎকৃষ্ট বা জ্ঞানবান্, সেই সর্বজ্ঞ পুরুষই বেদের কর্তা। তিনি পশ্যন্তি এবং মধ্যমা বাণীর আশ্রয়ে ঋষির হৃদয়ে বেদ জ্ঞানক প্রকট করেছেন। তিনি বৈখরী বাণীকে

আশ্রয় করে নিজের শিষ্য এবং প্রশিষ্যদের এই বেদজ্ঞান দিয়েছেন। এই ভাবে বেদের প্রচার হয়েছে—'বুদ্ধিকৃতা বাক্যকৃতির্বেদ'। (বৈ. দ.-৬.১.১)

ঋষিগণ বেদ মন্ত্রের কর্তা তাই বেদের যথাস্থানে তাদের নাম নির্দেশ করা হয়েছে। সঙ্গে তারা এটাও স্বীকার করেন যে, ঋষিদের যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে তা ঈশ্বরের অনুগ্রহেই প্রাপ্ত হয়েছে। আদিজ্ঞানদাতা পরমাত্মা বা ঈশ্বর। ঋগ্বেদ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ এবং জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে ঋষিদের জন্য 'মন্ত্রকৃত' এবং 'মন্ত্রপতি' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে ঋষিরা তপস্যা এবং শ্রমের দ্বারা বেদের জ্ঞানের অন্বেষণ করেছেন।

উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট হয়, মানুষের সর্বপ্রথম জ্ঞান বেদ, পরমাত্মার দ্বারাই প্রাপ্ত হয়েছিল। সেই জ্ঞান ঈশ্বরীয়। ঋষিরা নিজেদের প্রতিভার দ্বারা সেই জ্ঞানের গ্রহণ করেছেন। ঋষিগণ নিজেদের উচ্চ সাধনার দ্বারা সেই ঈশ্বরীয় সংকেত বা নির্দেশ প্রাপ্ত করেন। যোগদর্শন অনুসারে ঋষিদের যখন ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে যায়, তখন তাঁরা এই সংকেত বুঝতে সমর্থ হন। ঈশ্বরীয় জ্ঞান সর্বজনীন এবং সর্বকল্যাণাত্মক হয়। এই সংকেতকে ঋষিগণ স্থূল এবং বৈখরীয় প্রয়োগ করে মন্ত্রের রূপ দেন। ঋষিদের দ্বারা এই সংকেত গ্রহণ এবং তাকে বাণীর রূপ দেওয়াকে মন্ত্রদর্শন বলা হয়। তাকে স্থূলরূপে প্রকট করাকে মন্ত্রকর্তৃত্ব বলা হয়। সেই দিক থেকে ঋষিদের কখনও মন্ত্রদ্রষ্টা বা কখনও মন্ত্রকর্তা বলা হয়েছে। ভাব একই, কেবল শব্দের পার্থক্য।

মন্ত্র সার্থক না নিরর্থক

আচার্য যাস্ক নিরক্তের ১.১৫ অংশে একটি বিশেষ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেছেন, মন্ত্র সার্থক না নিরর্থক। এখানে কৌৎসের মত উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে তিনি বলেছেন মন্ত্র নিরর্থক। এর জন্য তিনি ৭টি মত উপস্থাপন করেছেন। তারপরে আচার্য যাস্ক নিজের সিদ্ধান্তে বলেছেন যে, মন্ত্র সার্থক এবং তার সপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন।

মন্ত্রের নিরর্থক পক্ষের যুক্তি—প্রথমতঃ বলা হয়েছে মন্ত্র নিরর্থক। তাই বলা হয়েছে—'অনর্থকা হি মন্ত্রাঃ' (নিরুক্ত—১.১৫)।

১. বেদমন্ত্রের পদক্রম নিয়ত, শব্দও নিয়ত। যদি মন্ত্র সার্থক হত, তাহলে মন্ত্রের ক্রমের বদল করা যেত, এক শব্দের স্থানে অন্য পর্যায়বাচী শব্দের ব্যবহার করা যেত। কিন্তু তা সম্ভব নয়। যেমন 'অগ্নিম ঈলে পুরোহিতম্' আমরা এই ক্রম বদলে দিতে পারি না। যেমন— ঈলে অগ্নিম্ বা অগ্নিম্ এর স্থানে 'বহ্নি' ব্যবহার করতে পারি না। তাই বলা যায় মন্ত্র নিরর্থক।

২. মন্ত্রের বিনিয়োগ ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বাক্যের দ্বারা করা হয়। যেমন 'ঊরু প্রথস্ব' (যজু—১.২২) এর বিনিয়োগ শতপথ ব্রাহ্মণের বাক্যের (২.৫.২০) দ্বারা করা হয়েছে।

যদি মন্ত্র সার্থক হত, তাহলে ব্রাহ্মণ বাক্যের দ্বারা তার বিনিয়োগ বলার দরকার হত না।

৩. মন্ত্রের অর্থ যুক্তিসঙ্গত নয়। যেমন বলা হয়েছে—'ওষধে ত্রায়স্ব এনম্' (যজু-৪.১)। এর অর্থ হল হে ওষধি, তুমি এই বালককে রক্ষা কর। ওষধি অর্থাৎ দুর্বা বা কুশ, যারা নিজেরা নির্জীব, তারা কীভাবে বালককে রক্ষা করবে।

৪. বৈদিক মন্ত্র পরস্পর বিরোধী। রুদ্রের বিষয়ে একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—'এক এব রুদ্রোঽবতস্থে ন দ্বিতীয়ঃ'। (তৈ. সং—১.৮.৬.১) অর্থাৎ রুদ্র একটি, এর দ্বিতীয় নেই। আবার অন্য স্থানে বলে হয়েছে—'অসংখ্যাতা সহস্রাণি যে রুদ্রা অধিভূম্যাম্' অর্থাৎ পৃথিবীতে অসংখ্য রুদ্র রয়েছে। এর দ্বারা জ্ঞাত হয় মন্ত্রের মধ্যে পরস্পর বিরোধী অর্থ বিদ্যমান।

৫. মন্ত্রে অনাবশ্যক নির্দেশ বর্তমান। যেমন—'অগ্নয়ে সমিধ্যমানায় অনুব্রুহি' (তৈ. সং-৬.৩.৭.১) অর্থাৎ জ্বলন্ত অগ্নিকে বল। হোতা নিজের বর্তমান কর্তব্য জানেন, তাকে অনাবশ্যক আদেশ দান করা হচ্ছে।

৬. মন্ত্রে একই পদার্থকে নানা ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন—'অদিতিঃ সর্বম্। অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষম্' (ঋগ্বেদ—১.৮৯.১০) অর্থাৎ অদিতিই সবকিছু। অদিতিই দ্যুলোক, অদিতিই অন্তরীক্ষ। একই পদার্থ দ্যুলোক এবং অন্তরীক্ষলোক কীভাবে হতে পারে?

৭. মন্ত্রের পদের অর্থ স্পষ্ট নয়, যেমন অম্যক্ (ঋগ্বেদ-১.১৬৯.৩)। যাদৃশিমন্ (ঋগ্বেদ-৫.৪৪.৮), জারয়ায়ি (ঋগ্বেদ—৬.১২.৪), কাণুকা (ঋগ্বেদ—৮.৭৭.৪)।

যাস্ক এই সকল মতের খণ্ডন করে সিদ্ধান্তপক্ষে বলেছেন—

১. লৌকিক ভাষাতেও নিশ্চিতক্রমযুক্ত প্রয়োগ পাওয়া যায়। যেমন—ইন্দ্রাগ্নী, পিতাপুত্রৌ। এদের ক্রম বদলানো যায় না।

২. মন্ত্রের বিনিয়োগ ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বাক্যের দ্বারাই করা হয়। এই বিনিয়োগ 'উদিতানুবাদ' অর্থাৎ কথিত বা স্পষ্টীকরণ মাত্র।

৩. 'ওষধি রক্ষা করুক' এই বাক্য অনুচিত নয় এর মধ্যে ব্যক্তির ভাবনা লুকিয়ে আছে। এর অর্থ এই নয় যে, ওষধি রক্ষা করবে, এখানে ভাবনা হল সেই বালকের যেন কোন ক্ষতি না হয়।

৪. রুদ্র এক হলেও অনেক। রুদ্র একজন মহাশক্তিশালী দেবতা। তার শক্তি অনন্ত। এটি একটি রুপকাত্মক বর্ণনা।

৫. মন্ত্রের নির্দেশ অনাবশ্যক নয়। লোকব্যবহারেই এইরকম হয়। যেমন— অভিবাদনে এই রকম হয়, যেমন কোন ব্যক্তি অন্যের নাম জানে তবুও কথা বলার সময় আবার তার নাম উচ্চারণ করে তাকে সম্বোধন করে। যেমন কিছু দেওয়ার সময় আমরা বলি দুধ খান,

কিন্তু ব্যক্তি যদিও জানেন যে, গ্লাসে দুধ আছে।

৬. একই পদার্থকে নানা ভাবে বর্ণনার কথা লৌকিকেও হয়। অদিতির সর্বব্যাপকতা বর্ণনা করার জন্য এই ধরণের বাক্য বলা হয়েছে। যেমন—জলই জীবন, জলেই সকল রস বিদ্যমান।

৭. মন্ত্রের অর্থ অস্পষ্ট নয়। কোশগ্রন্থাদি থেকে এর অর্থ জানতে হয়। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত এর মধ্যে অন্তর আছে। জ্ঞানী এবং অজ্ঞানীর মধ্যে অন্তর আছে। যেমন, কোন অন্ধ ব্যক্তি যদি কোন কিছুতে ধাক্কা লেগে পড়ে যায় এবং তার জ্ঞান না হয় যে কিসে ধাক্কা লাগল, সেক্ষেত্রে দোষ যাতে ধাক্কা লাগল তার নয়, দোষ সেই অন্ধ ব্যক্তির। অজ্ঞানতাই অস্পষ্ট অর্থের মূল কারণ—'নৈষ স্থাণোরপরাধো যদেনমন্ধো ন পশ্যতি। পুরুষাপরাধঃ স ভবতি'। 'অস্পষ্ট' পদের অর্থগুলি হল—অম্যক্ = প্রাপ্নোতি, যাদৃশ্মিম্ = যাদৃশে, জারয়য়ি = স্তয়তে, কাণুকা = কান্তানি, জর্ভরী = ভর্তারৌ, তুর্ফরী= হন্তারৌ, পর্ফরিকা —শত্রুণাং বিদারয়িতারৌ।

বেদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা পদ্ধতি

বেদের গূঢ় অর্থ স্পষ্ট করার জন্য বিভিন্ন আচার্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। এই বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

১. আচার্য যাস্ক—আচার্য যাস্কই প্রথম আচার্য যিনি বেদের ব্যাখ্যার জন্য আবশ্যক নিয়মের নির্দেশ করেছেন। প্রায় সকল পরবর্তী আচার্য যাস্কের নির্দেশ পালন করেছেন। বেদের ব্যাখ্যার সময় এই সকল নিয়মের পালন করতে হবে—

i. মন্ত্রের ব্যাখ্যা, প্রকরণ অনুসারেই করতে হবে, পৃথক্ভাবে নয়—'ন তু পৃথকত্বেন মন্ত্রা নির্ব্যক্তব্যাঃ। প্রকরণশ এব তু নির্বক্তব্যাঃ'। (নিরুক্ত—১৩.১২)

ii. মন্ত্রের ব্যাখ্যা, পরম্পরাগত পদ্ধতির জ্ঞানপূর্বক করতে হবে। সেই সঙ্গে তাতে যুক্তিসঙ্গতি থাকতে হবে। বেদার্থে পরম্পরাগত অর্থের জ্ঞান আবশ্যক এবং তা যেন যুক্তিসঙ্গত হয়। 'অয়ং মন্ত্রার্থচিন্তাহভ্যূহোভূঢ়ঃ। অপি শ্রুতিতেহপি তর্কতঃ'। (নি.-১২.১২)

iii. বেদে কিছু গূঢ় অর্থ লুকিয়ে আছে, তা আর্ষদৃষ্টির দ্বারা বা কঠিন পরিশ্রমের দ্বারা লাভ করা যায়। (নি.-১৩.১২)

iv. মন্ত্রের তিন প্রকার অর্থ হয়—১. আধিভৌতিক (প্রাকৃতিক) ২. আধিদৈবিক (বেদবিশেষের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত) এবং আধ্যাত্মিক (পরমাত্মা বা জীবাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত)। 'তাস্ত্রিবিধা ঋচঃ। পরোক্ষকৃতা, প্রত্যক্ষকৃতা আধ্যাত্মিকশ্চ' (নি.-৭.১)।

v. মুখ্যরূপে মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় হল এক পরমাত্মা। বিভিন্ন কর্ম এবং গুণ অনুসারে তার বিভিন্ন দেবতাবাচক নাম দেওয়া হয়েছে—'মাহাভাগ্যাদ্ দেবতায়া এক আত্মা বহুধা

স্তুয়তে'। (নি.-৭.৪)। অর্থাৎ অগ্ন্যাদি নাম সেই পরমাত্মারই নাম—'তাসাং মহাভাগ্যাদ্ একস্যা অপি বহুনি নামধেয়ানি ভবন্তি'। (নি.-৭.৫)

vi.পরম্পরাগত জ্ঞান আবশ্যক—'পরোবর্যবিৎসু তু খলু বেদিতৃষু ভূয়োবিদ্যঃ প্রশস্যো ভবতি'। (নি.-১.১৬) যিনি পরম্পরাকে জানেন তাকে 'পারোবর্যবিৎ' বলা হত।

vii.বেদার্থ গূঢ়, তাই এর ব্যাখ্যা সাবধানে করতে হয়—'গম্ভীরপদার্থো বেদঃ'।

আচার্য যাস্ক তৎকালীন সময়ে প্রচলিত সকল ব্যাখ্যা পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে বৈয়াকরণ, যাজ্ঞিক, ঐতিহাসিক, নৈরুক্ত উল্লেখযোগ্য। সায়ণ, মহীধর ইত্যাদি ব্যাখ্যাকারগণ এই পদ্ধতিকে আশ্রয় করেছেন। পরবর্তী বেদ ব্যাখ্যাকারগণ হলেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। তিনি নৈরুক্ত প্রক্রিয়াকে আশ্রয় করে বেদের ব্যাখ্যা নির্মাণ করেছেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় ৭/১০ মন্ত্র পর্যন্তই ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন। অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পণ্ডিত মধুসূদন ওঝা, ড. বাসুদেবশরণ অগ্রবাল, যোগী অরবিন্দ, শ্রী সাতবলেকর, ড. আনন্দ কুমার স্বামী, ড. বিষ্ণুকমার বর্মা ইত্যাদি।

পাশ্চাত্য বিদ্বান্‌রাও বেদার্থের অনুশীলনের জন্য ভাষাশাস্ত্র এবং ইতিহাসের আবশ্যকতার ওপরে জোর দিয়েছেন। এই পদ্ধতিকে ঐতিহাসিক পদ্ধতি বলা হয়। এর মূল ভাবনা হল ভারোপীয় ভাষা পরিবার এক। সংস্কৃত, লেটিন, গ্রীক, জার্মানী, ইংরেজী ইত্যাদি সকল ভাষা এই ভারোপীয় ভাষা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এই পদ্ধতির কিছু নিয়ম এখানে আলোচনা করা হল—

i. এই পদ্ধতির দ্বারা কেবল দেবতাবাচকাদি কিছু শব্দের স্পষ্টীকরণ হয়, অন্যের নয়। এইরকম শব্দ ১০ শতাংশ আছে।

ii. এই পদ্ধতিতে কর্মকাণ্ডের জ্ঞান এবং তার পদ্ধতির বিবরণ অজ্ঞেয়। এই অন্য পরম্পরাগত জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে।

iii. এই পদ্ধতিতে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়েছে।

iv. এতে বেদার্থের গূঢ় অর্থ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হয় নি।

v. বেদমন্ত্রের আধ্যাত্মিকতা এবং দার্শনিক অর্থের উপেক্ষা করা হয়েছে।

vi. এই পদ্ধতিতে মন্ত্রের অর্থের জায়গায় অনর্থের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং মনগড়া অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পদকার বা পদপাঠকার এবং বেদভাষ্যকার

১. শাকল্য—আচার্য শাকল্য ঋগ্বেদের পদপাঠ করেছেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে তাঁকে শাখাপ্রবর্তক বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে রথীধর, বাষ্কলি এবং ভরদ্বাজকেও শাখাপ্রবর্তক বলা হয়েছে—

"শাকল্যঃ প্রথমস্তেষাং তস্মাদন্যো রথীধরঃ।
বাস্কলিশ্চ ভরদ্বাজ ইতি শাখাপ্রবর্তকাঃ।।"

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, পূর্বভাগ, দ্বিতীয় পাদ, ৩৪)

যাস্ক নিরুক্তে কোথাও কোথাও শাকল্যের পদপাঠকে অস্বীকার করেছেন।

২. রাবণ—আচার্য রাবণও ঋগ্বেদের পদপাঠ প্রস্তুত করেছেন। কোথাও কোথাও শাকল্যের সঙ্গে পদপাঠের ভেদ পাওয়া যায়। রাবণ ঋগ্বেদের ভাষ্যও করেছেন।

৩। আত্রেয়—ইনি তৈত্তিরীয় সংহিতার পদপাঠ করেছেন। এর উল্লেখ ভট্টভাস্করের ভাষ্যে তথা বৌধায়ন গৃহ্যসূত্রেও করা হয়েছে।

৪. গার্গ্য—ইনি সামবেদের পদপাঠ করেছেন।

প্রাচীন বেদভাষ্যকারগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

ঋগ্বেদ—স্কন্দস্বামী, নারায়ণ, উদ্‌গীথ, মাধবভট্ট, বেঙ্কট মাধব, ধানুষ্ক যজ্বা, আনন্দতীর্থ, আত্মানান্দ, সায়ণ।

শুক্লযজুর্বেদ—(মাধ্যন্দিন)—উবট, মহীধর।

(কাণ্ব)—হলায়ুধ, সায়ণ, আনন্তাচার্য।

কৃষ্ণযজুর্বেদ—কুণ্ডিন, ভবস্বামী, গুহদেব, খুর, ভট্টভাস্কর, সায়ণ।

সামবেদ—মাধব, গুণবিষ্ণু, ভরতস্বামী।

অথর্ববেদ—সায়ণ।

শতপথ ব্রাহ্মণ—নীলকণ্ঠ, হরিস্বামী।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—গোবিন্দস্বামী, ষড়গুরুশিষ্য, সায়ণ।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ—ভবস্বামী, ভট্টভাস্কর, আচার্য সায়ণ।

সামবেদীয় ব্রাহ্মণ—জয়স্বামী, গুণবিষ্ণু, ভাস্করমিশ্র, ভরতস্বামী, দ্বিজরামভট্ট, আচার্য সায়ণ।

বেদের রচনাকাল

"প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বিদ্যতে।
এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাৎ বেদস্য বেদতা।।"

সনাতন ভারতের গগনে যেদিন প্রথম জ্ঞানের অরুণিমা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল, সেদিন থেকেই মানব সভ্যতার সংস্কৃতির প্রতীক, সনাতন ধর্মগ্রন্থ বেদ স্বমহিমায় বিরাজমান। ভারতীয়দের সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক মহত্ত্বকে বহু সহস্র বছর ধরে রেখেছে এই বেদ। কিন্তু এই সুমহান্ ধর্মগ্রন্থ বেদ কবে লিখিত আকারে আত্মপ্রকাশ করেছিল, কবেই বা এই

পরমজ্ঞান ঋষিমুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল, তা মানবমনে এক বিরাট আকার ধারণ করেছে। ভারতীয় পরম্পরা বেদকে অপৌরুষেয় মনে করেন। প্রলয়কালে অর্থাৎ যুগান্তে এই পরমজ্ঞান অন্তর্হিত হয়ে যায় এবং সৃষ্টিতে আবার সেই জ্ঞান ঋষিরা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে লাভ করেন। মহাভারতের বনপর্বেও বলা হয়েছে—

"যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্বমনুজ্ঞাতা স্বয়ম্ভুবা।।" (মহাভা./ বনপর্ব)।

বেদের রচনাকাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। যদি আমরা বেদকে অপৌরুষেয় বলে মনে করি, তাহলে বেদের রচনাকাল নির্ণয়ের কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু যদি বেদকে ঋষির সৃষ্ট বলে মনে করি, তাহলে তার একটা রচনাকাল অবশ্যই থাকবে। তবে বেদকে অপৌরুষেয় বলে মানলেও তা কবে লিখিতকারে প্রকাশ হয়েছিল, তার একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। কিন্তু বেদের ক্ষেত্রে লিখিতকাল এবং রচনাকাল এক নয়। তাই বিভিন্ন মনীষিগণ বেদের রচনাকাল নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। বেদের রচনাকাল নির্ণয়ে প্রধান অন্তরায় হল—

- প্রামাণিক অন্তঃসাক্ষ্য এবং বহিঃসাক্ষ্যের অভাব।
- প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থে তিথি, সংবৎসর ইত্যাদির উল্লেখের অভাব।
- বেদকে অপৌরুষেয় মনে করা।
- বেদে উল্লিখিত পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের রচনাকালের অনিশ্চয়তা।
- জ্যোতিষ সম্বন্ধিয় এবং ভৌগলিক উল্লেখের অস্পষ্টতা।
- ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে মৌলিক দৃষ্টিকোণের পার্থক্য।

তাই 'অগ্নীমিলে পুরোহিতম্' ইত্যাদি রচনার শুভসূচনা যে কবে হয়েছিল সেই বিষয়ে বেদ যেভাবে নীরবতা অবলম্বন করেছে, ঐতিহাসিক এবং গবেষকরাও সেইভাবে বেদের কাল নির্ণয়ে নিজেদের নানান্ মত নানা ভাবে প্রকাশ করেছেন—

ক্রমিক সংখ্যা	মত প্রতিপাদক	আধার	রচনাকাল
১.	স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী	বেদমন্ত্র	সৃষ্টির প্রারম্ভ
২.	দীননাথ শাস্ত্রী চুলেট	জ্যোতিষ	খ্রী.পূ. ৩ লক্ষ বর্ষ
৩.	অবিনাশ চন্দ্র দাস	ভূগর্ভ	খ্রী.পূ.২৫ হাজার বর্ষ
৪.	নারায়ণ চন্দ্র পাবগী	ভূগর্ভ এবং জ্যোতিষ	খ্রী. পূ. ৭ হাজার বর্ষ
৫.	বালগঙ্গাধর	জ্যোতিষ	খ্রী. পূ. ৬ হাজার বর্ষ
৬.	ড. আর. জী ভাণ্ডারকর	বেদমন্ত্র	খ্রী. পূ. ৬ হাজার বর্ষ
৭.	শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত	জ্যোতিষ	খ্রী. পূ. ৩৬০০ বর্ষ

৮.	জ্যাকোবি	জ্যোতিষ	খ্রী. পূ. ৪৫০০-২৫০০ বর্ষ
৯.	উইন্টারনিজ	মিতানী শিলালেখ	খ্রী. পূ. ২৫০০ বর্ষ
১০.	ম্যাক্সমুলার	বৌদ্ধসাহিত্য	খ্রী. পূ. ১২০০ বর্ষ

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরাই বেদের রচনাকালের বিষয়ে প্রথম সূত্রপাত ঘটান। পরবর্তীকালে ভারতীয় পণ্ডিতরাও যুক্তিজাল বিস্তার করে সেই আলোচনায় নতুন মাত্রা সংযোজন করেন। তাঁরা বিভিন্ন দিক থেকে বেদের রচনাকাল নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন—

সাহিত্যিক মতবাদ

১৮৫৯ সালে ম্যাক্সমুলার তাঁর A History of Ancient Sanskrit Literature গ্রন্থে এক তত্ত্বের অবতারণা করেন এবং প্রমাণ করেন ঋগ্বেদ ১২০০ খ্রী. পূ. রচিত। তিনি গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব তিথিকে নিজের তত্ত্বের আধার মনে করেন । বুদ্ধ বৈদিক হিংসা সমূহের নিন্দা করেছিলেন। তাঁর মতে ব্রাহ্মণ্যগ্রন্থের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। তাই বৈদিককাল বুদ্ধের জন্মের পূর্বে হওয়া উচিত। সেই দিক থেকে তিনি বৈদিককালকে চারভাগে ভাগ করেছেন—

i. ১২০০ খ্রী. পূ. থেকে ১০০০ খ্রী. পূ.। এর নাম ছন্দোকাল। এতে নিবিদ্ আদি স্ফুট বৈদিকমন্ত্রের রচনা হয়েছে।

ii. ১০০০ খ্রী. পূ. থেকে ৮০০ খ্রী. পূ। এটি মন্ত্র কাল। এই সময়ে বৈদিক সংহিতার রচনা হয়েছে এবং তার সংকলন হয়েছে।

iii. ৮০০ খ্রী. পূ. থেকে ৬০০ খ্রী. পূ.। এই কালের নাম ব্রাহ্মণকাল। এতে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের রচনা হয়েছে।

iv. ৬০০ খ্রী. পূ. থেকে ৪০০ খ্রী. পূ.। এই সময়ের নাম সূত্রকাল। এই সময়ে শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্রাদির রচনা হয়েছে।

কিছু সময় পর্যন্ত এই মত অত্যন্ত প্রচলিত ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে স্বয়ং ম্যাক্সমুলার এই মত বর্জন করেছেন। ১৪০০ খ্রী. পূর্বের শিলালেখ আবিষ্কার হওয়ার পরে এই মত অর্থহীন হয়ে পড়ে।

ভাষাতত্ত্বাশ্রয়ী মতবাদ

ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার করে পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদের রচনাকাল নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। তাদের মতে—

i. Whiteny বেদমন্ত্রের প্রাচীনতম অংশের জন্য রচনাকাল হিসেবে ২০০০-১০০০

কালকে নির্দিষ্ট করেছেন।

ii. Weber এর মতে বেদের রচনা কাল খ্রীষ্টপূর্ব ষোড়শ এবং Shroeder মতে এই সময় খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ থকে ২০০০ শতক।

iii. Benfy মনে করেন ঋগ্বেদের রচনাকাল ২০০০ খ্রীষ্টপূর্ব।

i. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রাচীন পারসিক এবং আবেস্তা ভাষার সঙ্গে বৈদিক ভাষার সাদৃশ্য বিচার করে ঋগ্বেদের রচনাকালকে ১০০০ থেকে ৯০০০ খ্রী. পূ. বলে মনে করেছেন।

জ্যোতিষবিদ্যাবিষয়ক মতবাদ

হাউগ—হাউগ বেদাঙ্গ জ্যোতিষের একটি শ্লোক থেকে সূর্যের অয়ন বিচার করে বেদের কাল নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন—

"প্রপদ্যেতে শ্রবিষ্ঠাদৌ সূর্যচন্দ্রমসাবুদক্।
সর্পোধে দক্ষিণীর্কস্তু মাঘশ্রবণয়োঃ সদা।।"

শ্লোকে উল্লিখিত সূর্যের অবস্থান অনুসারে হাউগ বৈদিক সংহিতা রচনা করেছেন এবং তাঁর মতে বেদের রচনাকাল ২০০০ থেকে ১৪০০ খ্রীষ্টপূর্ব এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থের রচনাকাল ১৪০০ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টপূর্ব।

বালগঙ্গাধর তিলক—বালগঙ্গাধর তিলক বিভিন্ন নক্ষত্রের বসন্ত-সংপাত (vernal equinox) কে আধার করে ঋগ্বেদের রচনাকাল ৬০০০ থেকে ৪০০০ খ্রীষ্টপূর্ব বলে মনে করেছেন। তিনি বৈদিককালকে চারভাগে ভাগ করেছেন—

কাল	খ্রীষ্টপূর্ব কাল	দৃষ্ট বা প্রণীত গ্রন্থ
অদিতিকাল	৬০০০-৪০০০	নিবিদ্ মন্ত্র (গদ্যপদ্যাত্মক যজ্ঞীয় বিধিবাক্যযুক্ত)।
মৃগশিরাকাল	৪০০০-২৫০০	ঋগ্বেদের অধিকাংশ সূক্ত।
কৃত্তিকাকাল	২৫০০-১৪০০	চার বেদের সংকলন, তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং কিছু ব্রাহ্মণ গ্রন্থ।
সূত্রকাল	১৪০০-৫০০	সূত্রগ্রন্থ এবং দর্শন গ্রন্থ।

শঙ্করবালকৃষ্ণ দীক্ষিত—দীক্ষিত মহাশয় শতপথ ব্রাহ্মণের কালকে ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব মেনে, চারবেদের রচনাকালকে ৩৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব মনে করেছেন।

জ্যাকোবি—প্রসিদ্ধ জার্মান বিদ্বান্ জ্যাকোবি ধ্রুবতারাকে নিজের গণনার আধার করেছেন। বৈদিক সাহিত্যে বিবাহ সংস্কারে 'ধ্রুবং পশ্য' ইত্যাদি বিধি আছে। ধ্রুবতারার অবস্থানের ওপরে নির্ভর করে ঋগ্বেদের সময়কালকে ৪৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব মনে করেছেন।

কামেশ্বর আয়ার—কামেশ্বর আয়ার কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থান বিচার করে বেদের

কালকে আনুমানিক ৪৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব মনে করেছেন।

বেদমন্ত্র ও ভূতাত্ত্বিক মতাবলী

অবিনাশচন্দ্র দাস—অবিনাশচন্দ্র দাস ঋগ্বেদে প্রাপ্ত ভূগোল এবং ভূগর্ভসম্বন্ধী সাক্ষ্যকে আধার করে ঋগ্বেদের রচনাকাল ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব মনে করেছেন। ঋগ্বেদে এক জায়গায় বলা হয়েছে সরস্বতী নদী হিমালয় থেকে নির্গত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়েছে। পুরাতত্ত্ব গণনানুসারে এই সমুদ্র রাজস্থানে ছিল, যা বর্তমানে বিলুপ্ত। এটি খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দের ঘটনা। তাই মনে করা হয় ঋগ্বেদ এই ঘটনার পূর্বে লেখা হয়েছিল।

উইন্টারনিৎজ—যাস্কের সময়ই (পাণিনির পূর্বে) বেদের বহু অংশ দুর্বোধ্য হয়ে গিয়েছিল। এই ভাষাতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে তিনি মনে করেন, বৈদিক সাহিত্যের সূত্রপাত ২৫০০ থেকে ২০০০ খ্রীষ্টপূর্ব এবং চরম পরিণতি ৭৫০ থেকে ৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী—আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বেদাদির সন্দর্ভের দ্বারা প্রতিপাদন করেছেন যে, বেদাদির উদ্ভব পরমাত্মার দ্বারা সৃষ্টির প্রারম্ভে হয়েছিল। সেই পরমাত্মাই অগ্নি থেকে ঋগ্বেদ, বায়ু থেকে যজুর্বেদ এবং সূর্য থেকে সামবেদের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর দ্বারাই অথর্ববেদের সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিষয়ে তিনি কিছু উদ্ধৃতিও দিয়েছেন—

i. *"তস্মাদ্ যজ্ঞাত্ সর্বহুত ঋচ সামানি জজ্ঞিরে।*
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাত্ যজুস্তস্মাদজায়ত।।" (যজু -৩১/৭)

ii. *"যস্মাদ্ ঋচো .....যজু.....সামানি....অথর্বাঙ্গিরসঃ...।"*
(অথর্ব-১০/৭/২০)

iii. *"অগ্নিবায়ুরবুভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্।*
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থম্ ঋগ্যযজুঃ সামলক্ষণম্।।" (মনু.-১.২৩)

iv. *"অগ্নে ঋগ্বেদো বায়োর্যজুর্বেদঃ সূর্যাৎ সামবেদঃ"।* (শ. ব্রা., ১১.৮.৩)

এইসব আলোচনার ভিত্তিতে খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০-৫০০ পর্যন্ত সময়কালকে বৈদিক সাহিত্য রচনার এবং সংকলনের কাল হিসেবে নির্দেশ করলে যুক্তিবাদীদের কাছে সবথেকে কম সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে। তবে পণ্ডিতেরা যতোদিক থেকেই বেদের কাল নির্ণয়ের জন্য প্রয়াস করুন না কেন, সর্বসম্মত মতে উপনীত হওয়া এখনও সম্ভব হয় নি। তবে ভাবীকালে হয়তো তা সম্ভব হবে।